জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ▢ ৭৫ টাকা

দেশভাগ ৭৫

সংরক্ষণ বিতর্ক ▢ নাট্যদলের উপর হামলা

আসামে চা-বাগিচায় আন্দোলন ▢ কবিতা

অনীক

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ৭-৮
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা পয়সা পাঠাবার ঠিকানা
প্রযত্নে পিপলস্ বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৯৮৩০১৪৩৩৬৫
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ২০০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpatrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)

স্মৃতিকথা

ছোট খুকির স্মৃতিতে ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও দেশভাগ

আহমেদী বেগম

ছোটবেলার কথা মাঝে-মাঝে মনে হয়; হঠাৎ কোনকিছু দেখার পর মনে পড়ে যায়। তেমনি সেদিন রথের একটা ছবি দেখার পর পরেশনাথের মন্দিরের কথা মনে পড়ল। মনে আছে, যেদিন পরেশনাথের মন্দির বেরোবে, কোথা থেকে আসত জানিনা, বিডন স্ট্রিটের রাস্তা দিয়ে যেত। অনেক বড়ো মিছিল-বাজনা, বড়ো একটা মন্দির, ওটাও প্রায় রথের মত দেখতে। কিন্তু কোন সম্প্রদায় সেই মন্দির বের করত জানিনা। সঙ্গে জোকার থাকত, ওরা রাস্তায় নাচের মত করে, অঙ্গভঙ্গি করে মানুষ হাসাত; তখন ওদের বলত সঙ, সাজগোজও ছিল সঙের মত। তো সেই মন্দির দেখতে আমরা অনেক ছেলেপুলে সব [মিনার্ভা] থিয়েটারের গাড়ি বারান্দার ছাদে যেতাম। মন্দির চলে গেলে নেমে আসতাম।

আসলে আমাদের ছেলেবেলা অন্যরকম সব ছিল। এখনকার সাথে মেলে না। আমার কাছে আমাদেরটাই ভালো। এখন তো সব জায়গায় একটা ভয় ভয়। বাচ্চাদের একা ছাড়ার উপায় নেই। আমরা একা একা কত দূরে চলে যেতাম, সন্ধ্যা হলে ঠিক যার যার বাড়ী চলে আসতাম। ভয়টা দিন দিন যেন বাড়ছে। কেউ বাইরে গেলে যতক্ষণ না ফিরে আসে, ততক্ষণ শান্তি নেই। বিভিন্ন জায়গায় দুর্ঘটনা ধরপাকড়। আমাদের আমলে এসব ছিল না। হয়তো ছিল; ছোট ছিলাম বলে জানতে পারতাম না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সবাই কলকাতা ছাড়ল। বাবুজী আমাদের নিয়ে বিহারের মধুপুরে গেল। একটা বড়ো বাড়ী ভাড়া নেয়া হল। পরিবারের অনেক লোক একসাথে থাকত। সেই বাড়ীর মালিক বিহারী। কলকাতা এলেই আমাদের সাথে দেখা করতেন। ভদ্রলোক খুবই ভাল ছিলেন, নামটা আমার মনে আছে, 'লুকমান সাহেব'।

আহমেদী বেগম

রায়টের আগের সময়টা আমার কাছে খুব প্রিয়। আবার যদি ফিরে যেতে পারতাম, সেই আগের মানুষগুলো ফিরে আসত! আসলে আমি খুব আদরে মানুষ হয়েছি, যতদিন বাবুজী (বাবা) ছিল। মনে পড়ে আমি তখন বেশ ছোট। আমার বাবুজী হঠাৎ আমায় ঘুম থেকে ডেকে বাড়ীর [উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রীট সংলগ্ন ৮ রামচাঁদ ঘোষ লেন] বাইরে নিয়ে এসে থিয়েটারের দিকে নিয়ে গেলেন। গ্যারেজ থেকে গাড়ী বার করে আমাকে পাশে বসিয়ে গাড়ী চালাতে লাগলেন। পথে চেনা এক ভদ্রলোক গাড়ীতে উঠলেন। উনি বললেন, আমাকে পেছনে দিয়ে ভদ্রলোক সামনে আসবেন, কথা আছে। বাবুজী ওনার কথা শুনলেন না, আমাকে পেছনে পাঠালেন না; কি জানি বললেন এখন আমার আর তা মনে নেই।

ছোটবেলা কিভাবে কাটল, সেটা খুব বলতে ইচ্ছে করছে। সবচেয়ে বড়ো কথা আমার পরম পূজনীয় বাবার অল্পকটা স্মৃতি আমার মনে আছে। মনে হত আর তো আমাকে বুড়ি বলে কেউ ডাকবে না, আদর করে ঘুম থেকে তুলে রসগোল্লা খাওয়াবে না, খেলনা কিনে দেবে না। এক শোকেস ভরা দামী দামী খেলনা ছিল। কিছু খেলনা রায়টের পর এসেছিল। বড়ো বড়ো দুটো মেম

আহমেদী বেগম-এর জন্ম ১৯৪০ সালে, উত্তর কলকাতায়; সেটাই তাঁর পূর্ব-পুরুষদের আদি নিবাস। দাঙ্গা ও দেশভাগ পরবর্তী পরিস্থিতির শিকার হয়ে পিতৃহীন তিন শিশুকন্যাকে নিয়ে তাঁর মা কলকাতা ছেড়ে ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। তিনি তাঁর পুত্রের অনুরোধে প্রায় ৭৫ পৃষ্ঠার স্মৃতিচারণা লিখেছিলেন এবং কলকাতার একজন গবেষকের অনুরোধে দাঙ্গা ও দেশভাগ বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা লিখে গিয়েছিলেন। ২০২০ সালের ২৮ জুন তাঁর মৃত্যুর পর লেখার বড়ো অংশটি পাওয়া যায়। বর্তমান লেখাটি তাঁর পরিবারের কাছ থেকে সংগৃহীত। মূল বানান অপরিবর্তিত।

ছিল, বাদামী চুল। দস্যুরা ওগুলো নেয়নি। মনে ভেবেছিল বাচ্চা একটা মেয়ের জীবন থেকে তার বাবা হারিয়ে যাবে, অনেক দুঃখ। খেলনাগুলো থাক, হয়তো কিছুটা সময় ভুলে থাকবে। আমি তো এখনও ভুলতে পারিনি। '৪৬ সালের পর তো বাবুজীকে হারালাম! আমার বাবা বেশী দিন বেঁচে থাকেননি। আমার যখন ছয় বছর বয়স তখন মারা গেছেন ব্রেন প্যারালাইসিস হয়ে।

সাল ১৯৪৬। মাসটা ঠিক মনে নেই, আগস্ট সেপ্টেম্বর হতে পারে। তারিখটাও মনে নেই। তবে রায়টের কথা মনে আছে। তখন আমার বয়স খুব কম, সেজন্য তারিখ বা মাস মনে থাকার কথা নয়। আমার জন্ম ১৯৪০ সালে।

চারদিক থেকে শোনা যাচ্ছিল গণ্ডগোলের কথা। হঠাৎ একদিন আমার আব্বা বাসায় এসে আমাদের সবাইকে নিয়ে পাশের বাড়ী রেখে এলেন, ওখানে আমাদের মুরুব্বীরা আছেন। তো সেই রাত কাটল। সকাল আনুমানিক ১০/১১টা হবে। এর আগে বাবুজী বেরিয়ে গিয়েছিল। সকালে চারিদিক থেকে গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। বড়োরা খুব বিচলিত। কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। কিছু লোক আমাদের পাড়ায় ঢুকে পড়ল। তলোয়ার নিয়ে মারামারি শুরু হল। অনেক লোক হতাহত হলো, আমি সঠিক বলতে পারবো না, বড়দের মুখ থেকেই যেটুকু শোনা এবং যেটুকু আমার মনে আছে ততটুকুই আমি লিখব। চাক্ষুষ আমি কিছু দেখিনি। যেটুকু চাক্ষুষ দেখেছি সেটুকু লেখার চেষ্টা করব।

বেলা বাড়তে লাগলো। বাইরে অনেক গণ্ডগোল। বাড়ীর ভেতর আমার চাচারা বাবার বন্দুক নিয়ে ছাদে উঠে ফায়ার শুরু করে দিল। নিচের দরজা বন্ধ। তার জন্য তারা [দাঙ্গাকারীরা] বাড়ীর ভেতরে ঢুকতে পারেনি। তাদের সবার হাতে তলোয়ার ছিল। আর কি ছিল জানি না।

তার মধ্যে আমার আব্বা সবার কাছে হাতজোড় করে বলতে গেলেন "দয়া করে আপনারা মারামারি করবেন না, আমার বাপ-দাদারা এখানে অনেক পুরুষ থেকে বসবাস করে আসছেন, হিন্দু-মুসলমান সব আমরা ভাইয়ের মতো আছি।" জানিনা দাঙ্গাওয়ালারা আব্বার কথা শুনত কিনা। ইতিমধ্যে আমাদের যে দুধ দিত, সে বাজুজীকে টেনে নিয়ে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেল এবং সেখানে শুইয়ে রাখল, বেরুতে দেয়নি। সে বলেছিল, "করছেন কি দাদা, আপনি এদিকে আসুন।" এইটুকু বলে সে সেদিনকার মত আব্বাকে বাঁচিয়ে রাখল। এদিকে আমরা এ বিষয়ে কিছুই জানি না, বাবুজী গোয়ালার বাড়ী লুকিয়ে রইল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরকম, সেদিন থেকে তিন মাসের মাথায় তিনি পরপারে চলে গেলেন। রেখে গেলেন ছোট ছোট তিন কন্যাসন্তান।

বাসার বাইরে দাঙ্গা চলতে লাগল, বাড়ীর ভেতর আমরা বন্দী। আমাদের বাড়ীর গায়ে গায়ে লেগে একেবারে বাড়ী পাশেই এক হিন্দু বাড়ী। তাদের সাথে আমাদের খুবই অন্তরঙ্গতা। ভদ্রলোকের নাম কালীচরণ (উনি বাবুজীদের বন্ধু ছিলেন)। ওনাকে গিয়ে আমার এক চাচা বললেন, "কালি'দা আমাদের বাড়ীর মেয়েদের একটু জায়গা দেবে?" তিনি তক্ষুণিই রাজি হয়ে গেলেন। এখন মনে হয় স্বয়ং বিধাতাই বুঝি ওনাকে আমাদের এখানে পাঠিয়েছিলেন। তা না হলে আজ আমরা বেঁচে থাকতাম না। তিনতলার এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে, ঠিক যেমন করে বল দেয়, সেইভাবে আমাদের তিন বোনকে উনি ধরে নিলেন। এক বোন আমার ফুফুর মেয়ে। আমার ছোট বোন মায়ের কাছে রয়ে গেল। মহিলারা দো'তলার একটা জানালা ভেঙে পাশের বাড়ীর বারান্দায় গিয়ে পড়লেন। পুরুষরা কে কোথায় কে জানে! হিন্দু মহিলারা আম্মাদের সিঁদুর পরালো, আলতা পরালো। তারপর আমাদের সবাইকে একতলায় পূজার ঘরে তালা মেরে রেখে দিলেন। আরও বলল, "কথা বলবেন না চুপ করে থাকেন।" তখন রোজার দিন, তাই খাবার ঝামেলা নেই। পাঁচজন মহিলা, আমরা চার বোন প্রায় অভুক্ত অবস্থায় বড়দের সাথে ঘরে বন্দী হয়ে থাকলাম। বাইরে প্রচুর গোলমাল। ছাদ থেকে আমার চাচারা অনবরত বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছেন। দুপুর পেরিয়ে যেতে দরজা খুলে কটা রুটি, কলা আর পানি দিয়ে গেল বাড়ীর লোকজন। ওগুলো খেলাম।

অনেকক্ষণ থাকার পর হঠাৎ দরজার তালা খুলে আমাদের বেরিয়ে আসতে বলল। সবাই বেরিয়ে এলাম। একি! গুলির শব্দ নেই, পুলিশের বাঁশির শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাইরে লোকে লোকারণ্য, একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে। সব লোকেরা ট্রাকে উঠছে। আমাদের বাড়ীর দিকে যেতে না দিয়ে ট্রাকের দিকে যেতে বললো। কিন্তু ট্রাক ভর্তি হয়ে গেছে। অগত্যা হাঁটতে হবে। শুরু হল হাঁটা, সবার পা খালি, কারো পায়ে জুতো নেই। আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি খালি পায়ে হাঁটছি; দুপুর, ওপরে রোদ নিচে পিচ গরম হয়ে পা রাখা যাচ্ছে না। তার ওপর কাঁচ ভাঙ্গা পড়ে আছে। পা পুড়ে যাচ্ছে। ছয়বছর বয়সের স্মৃতি আমার এখনো মনে আছে। রাস্তায় কত যে লাশ পড়ে আছে! অনেকগুলো লাশ ছিল।

শুরু হল আমাদের নিজের বাড়ী ছেড়ে অজানার উদ্দেশে যাত্রা। আপনজন কে কোথায় জানিনা, শুধু পায়ে হেঁটে চলা। তারপর এক সময় একটা বড় বাড়ীর সামনে এলাম। পরে জানতে পারলাম ওটা থানা [বটতলা থানা]; হেঁটে-হেঁটে থানা পর্যন্ত এলাম। আমরা দো'তলার একটা ঘরে গিয়ে বসলাম। বড়রা সব রোজা। আমাদের তিনজনকে ভাত আর ডাল দেয়া হলো। সন্ধ্যার সময় থানার ওসির বাড়ী থেকে বড়দের ছোলা আর সরবত দেয়া হল, শুধু আমাদের বাড়ীর লোকজনকে। তবে একথাগুলো বড়দের মুখে শোনা, ওসি সাহেব ছিলেন আমার চাচার বন্ধু; তাই আমাদের ওনার শোয়ার ঘরে জায়গা দেওয়া হল। বাকি সবাই বাইরে ছাদে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। বাবুজির তখনো পাত্তা নেই। চাচারা সবাই এসেছে। সবাই বলাবলি করছে "ছুন্নু ভাইয়াকে হিন্দুরা মেরে ফেলেছে।" ওসি সাহেব ঘরে এসে বললেন, "আমি পুলিশ নিয়ে যাচ্ছি ছুন্নুবাবুকে খুঁজে আনতে।" এসব আমার নিজের চোখে দেখা।

সন্ধ্যার পর ওসি সাহেব পুলিশ ফোর্স নিয়ে আমাদের বাড়ীর দিকে গেলেন আমার আব্বার সন্ধানে। ঠিকই উনি পেয়ে গেলেন। কোথায় আমার আব্বা ছিলেন সেটা আগে লিখেছি। এখন আমার জানতে ইচ্ছে করে কেমন করে খুঁজে পাওয়া গেল বাবুজীকে? শুধু মনে পড়ে বাবুজী হাসতে-হাসতে আসছিল। ঘরে সবার সাথে দেখা করে গেল। ওসি সাহেব আমার বাবা-চাচাদের নিয়ে আবার গেলেন। কিছু জিনিসপত্র আনা যায় কিনা; যে যার সাধ্যমত কাপড়চোপড় নিয়ে এলো। থানার পাশেই একটা গরুর খামার ছিল, সেখান থেকে অনেক দুধ দেয়া হল। যে যার দরকার মত লাইন দিয়ে দুধ নিয়ে এল। আর একটা প্রতিষ্ঠান থেকে বিস্কুট দেওয়া হয়েছিল।

শুনেছি পরেরদিন সরকার থেকে বলা হল থানা খালি করতে; ওসি সাহেবের উপর অনেক চাপ এল, উনি মুসলমানদেরকে থানায় জায়গা দিয়েছেন। থানা এক্ষুণি খালি করতে হবে। বাধ্য হয়ে সবাই যে যার মত চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল। কলুটোলা নামে একটা মুসলমান পাড়ায় আমরা গেলাম। তখন কলুটোলায় মাড়োয়ারিদের বেশ কয়টা খালি বাড়ী ছিল। সেখানে গিয়ে উঠল সবাই, আমরাও গেলাম। সেখানে লঙ্গরখানা থেকে খিচুড়ি দেওয়া হত। আমরা তাই খেয়ে একদিন কাটালাম। আমরা অবশ্য একদিন ছিলাম। পরের দিন আমার এক দুলাভাই আর এক চাচা লোক মুখে খবর পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে কলুটোলায় আমাদের সন্ধান পেল। তখন আমরা সবাই যে যার মত চলে এলাম। আমার এক চাচার পার্ক সার্কাসের (ঝাউতলা রোড) বাড়ীতে আমরা উঠলাম। অন্য আত্মীয়রা যার যার আত্মীয়ের বাড়ী উঠলো। ২০০৮ সালে যখন কলকাতা গেলাম, তখন সেই বাড়ীটা দেখেছি। ওখান থেকেই আমাদের শিলং যাত্রা।

রায়টের পর যখন পার্ক সার্কাসে আমার চাচার বাসায় এলাম তার কিছু দিন পর ঈদ। আমি তো খালি পায়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে ছিলাম। যার জন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় আমার পা পুড়ে যাচ্ছিল পিচের রাস্তায়। সেদিন খুব রোদ ছিল (বাংলা বোধহয় ভাদ্র মাস)। আবছা আবছা মনে পড়ে যাচ্ছে বাবুজী আমাকে নিয়ে গেল জুতা কিনে দেবার জন্য। মুসলমান পাড়া, এখন মনে হচ্ছে মল্লিক বাজারে বাবুজী গিয়েছিল। তো আমাকে জুতো পছন্দ করতে বললে আমি কি পছন্দ করলাম? একটা আকাশী রংয়ের "কাবুলি শু"। এখন কাবুলি শু দেখা যায় না। রং যাই হোক, ঐ জুতোটাই আমাকে বাবুজীর সাথে করে নিয়ে গিয়ে কিনে দেয়া শেষ জুতো।

এখন আমি ভাবি সেদিন যদি কালীবাবু আমাদের সবাইকে আশ্রয় না দিতেন, তাহলে আমাদের কারু বেঁচে থাকার কথা নয়। একেই বলে নিয়তি!

[১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যুদ্ধ শুরু হলে] কিছু কিছু দরকারী জিনিষপত্র গুছিয়ে হাতের কাছে রেখেছিলাম। যেমন এক প্রস্থ কাপড়, দুটো বালিশ, অল্প কিছু টাকা ইত্যাদি। এগুলো গুছিয়ে রাখার কারণ ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় আমাদের এক কাপড়ে বের হতে হয়েছিল [সেই অভিজ্ঞতা]।

রায়টে আমাদের কি সর্বনাশ হল এখন সেটা ভাবি। রায়ট হল, কিন্তু বাবুজী যদি বেঁচে থাকত তাহলে হয়তো আমাদের, বিশেষ করে আম্মার এত কষ্ট হত না। সর্বস্ব হারিয়ে বাবুজী দিশেহারা। এমন সময় আমার শিলংয়ের ফুফু বাবুজীকে বললেন কয়েকদিনের জন্য সবাইকে নিয়ে শিলং যাবার জন্য। তখন আমরা শিলং চলে গেলাম। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর আমার বাবার স্ট্রোক করল। যেদিন বাবুজীর প্রথম স্ট্রোক হয় সেদিনের কথা এতদিন পরও মনে আছে। হঠাৎ মাঝ রাত্রে আম্মা আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বাবুজীকে ডাকতে বললেন। আমি বাবুজী বাবুজী করে অনেক ডাকলাম। কিন্তু কোনো সাড়া নেই! কী রকম গোঁ-গোঁ শব্দ হচ্ছিল

মুখ থেকে। এখন বুঝি ওঠাই "স্ট্রোক"। এইভাবে আড়াই মাস ভোগার পর উনি ২১ ডিসেম্বর শিলংয়ে মারা গেলেন। সকালে মারা গেল। আমাদের ছোটদের অন্য বাড়ী পাঠিয়ে দেয়া হল। বিকালে ফিরে এসে দেখলাম আম্মা বারান্দায় বসে বাবলীকে বোতলে দুধ খাওয়াচ্ছে। এখন আমি ভাবি তখন আম্মার মনের অবস্থা কী হয়েছিল। তিনটা ছোট ছোট সন্তান, ঘরবাড়ী সব গেল, এখন কী হবে? কোন কূলকিনারা নেই। বড়োদের ভাষায় "কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি"। আমার তখন এগুলো বোঝবার কথা নয়। সেইভাবে দিন কাটতে লাগল। জনবল নেই, অর্থবল নেই, কিছু নেই; শুধু ভেসে থাকা। ভাসতে ভাসতে তরী কোথায় যাবে সেটা জানা নেই। রায়টে সব যখন খোয়া গেল, বাবুজীর মাথা প্রায় খারাপ। তখন বাবুজী বলেছিল কলকাতা আর যাব না, শিলংয়ে একটা ব্যবসা করব, শিলংয়ে থাকব। সেই শিলং থেকে আসা হলনা। [তাঁর মৃত্যুর] চল্লিশদিন হবার পর আমরা কলকাতায় চলে এলাম। এই শেষ বয়সেও বাবুজীর কথা মনে হলে আমার চোখে পানি আসে।

হিন্দু-মুসলমান রায়ট না হলে অবস্থা এত খারাপ হত না। সবই গেল, মানুষ গেল, বাড়ীঘর সবই গেল, নগদ টাকা গেল। তখন তো কিছু বুঝতাম না। এখন এগুলো ভাবতে বসলে কি রকম লাগে। মনে আছে আমাদের লয়েডস ব্যাংকে টাকা ছিল। একদিন খবর হল ব্যাংক ফেল হয়েছে, ব্যাংক ফেল মানে কি জানিনা। সবাইকে বলাবলি করত শুনেছিলাম ওই ব্যাংকে চার হাজার টাকা ছিল, সেটা আর পাওয়া যাবে না। ভরসা শুধু বাড়ীটা আর গয়না। অনেক গয়না ছিল আমাদের। এখন কেউ বিশ্বাস করবে না, ভাববে মিথ্যা। বাড়ী নিয়েও কি কম ফ্যাসাদ। আমি এতই ছোট তখন অনেক কিছুই বুঝতাম না।

নিজেদের বাড়ী আর যাওয়া হয়নি। পার্ক সার্কাসে বাড়ী ভাড়া করে থাকা হল। তারপর সেখানকার অবস্থা বুঝে আস্তে-আস্তে জিনিসপত্র নিয়ে এল সবাই। [আম্মা] মানিক মামার সাহায্যে বন্দুক বিক্রী করল। কিছু কিছু ফার্নিচার বিক্রী হল। আমাদের বাড়ী প্রথমে ভাড়া দেওয়া হল, বেশ কয় বছর পর বাড়ী বিক্রী করে দিল আম্মা। কারণ ভাড়া তোলার অসুবিধা। আমরা পার্ক সার্কাসে ভাড়া বাড়ীতে থাকতে লাগলাম।

বাড়ী তো বিক্রী হল, [সব] টাকা আম্মা পেল না। আমাদের [মেয়েদের] ভাগের টাকা কোর্টে জমা থাকল। মাসোহারা হিসেবে সেই টাকা তোলা হত। আমার দাদার বাড়ী বিক্রী হল, সেখান থেকে ভাগের টাকা এল। এইভাবে দিন পার হল। গয়না বিক্রী হল।

স্কুলে ভর্তি হলাম; আম্মা পার্ক সার্কাসের ভিতর একটা স্কুলে আমাকে ভর্তি করেছিল। একদিন নাহার ভাইয়া [বড়ো ফুফুর ছেলে] বলল বুজুকে সাখাওয়াতে দেন। আম্মা বলল ওতে বাস ভাড়া লাগবে। ভাইয়া বলল পড়ার খরচ আমি দোব। প্রতি মাসে ভাইয়া এসে ১০ টাকা দিয়ে যেত। বেতন ৩ টাকা, বাস ভাড়া ৩ টাকা। তারপর বইখাতা কিনতে হলে আমাকে নিয়ে কলেজ স্ট্রিট গিয়ে সব কিনে দিতেন। আমার জুতা-জামা যা লাগত, ভাইয়াকে বললে কিনে দিত।

তখন থাকতাম ৪ নম্বর পুলের বাঁ দিকে, দরগা রোডে। তখন প্রায় মাঝে-মাঝে রায়ট হত। গোলমাল, চীৎকার, আল্লাহু আকবর শব্দ ভেসে আসত দূর থেকে। মুসলমানরা খুবই ভয়ে ভয়ে থাকত, যেকোন সময় হামলা হতে পারে। এখানে থেকে শান্তি নেই, সব সময় একটা আতঙ্কের মাঝে বসবাস। তখন তো মাঝে-মাঝেই এখানে সেখানে গোলমাল। তখন আমি বেশ ছোট, বেশী কিছু বুঝতাম না। সবাই বলাবলি করত মুসলমানরা সব পাকিস্তান চলে যাচ্ছে। কেউ বাড়ীঘর বিক্রী করে, কেউ বিনিময় করে। যাদের তাও নেই, তারা যৎসামান্য তৈজসপত্র যা আছে সেটা বিক্রী করে চলে গেল পাকিস্তানে। অনেকে ভয়ের জ্বালায় চলে গেল। সাহসী যারা থেকে গেল। আমরা সেই ভয়ের দলে।

জানিনা কে আম্মাকে পরামর্শ দিল পাকিস্তানে চলে যাবার। ঘটিবাটি বেচে পাকিস্তান যেতে হবে, সেখানে প্রাণের ভয় নেই। আমি জানিনা, কেমন করে কি হল। শোনা গেল সবাই যার যা আছে সব বেচে পাকিস্তান চলে যাচ্ছে; তাও আবার প্লেনে। কাজেই টাকা বেশী লাগবে। কত রকম গুজব— ঢাকা থেকে ট্রেন আসছে সব রক্ত, মানুষ নেই। নোয়াখালীতে অনেক গণ্ডগোল, গান্ধী নোয়াখালী গিয়ে দাঙ্গা থামিয়েছেন।

আম্মা সব বিক্রী করে চলে যেতে মন স্থির করল। আমরা তিন বোন তখন বেশ ছোট। প্লেনের টিকিট ঢাকার পাওয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে চিটাগাং এর টিকিট কাটা হল। ভরসা তখন মোমতাজ ভাই চিটাগাং ছিল। উনি তাঁর এক কলিগের বাসায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করল। আম্মা আলাদা রান্না করল। মোমতাজ ভাইর মাধ্যমে বগুড়ায় জমি কেনা হয়েছিল [আগে]। সেই জমির সূত্র ধরে বগুড়ায় যাওয়া। ধান বিক্রীর টাকা পাওয়া যেত, সেই জন্য বগুড়া যাওয়া। ঠিক হল ছোট শহর, খরচ কম। কিন্তু আম্মা তো বগুড়ায় টিকতে পারল

না। অন্ধকার শহর, আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। পরের ভরসায় কি থাকা যায়? অল্পবয়সী মহিলা, ছোট-ছোট সন্তান নিয়ে হয়তো মনে করল এখানে থাকব না। ঢাকায় অনেক আত্মীয়পরিজন। ঢাকায় চলে এলাম। আম্মা হঠাৎ হঠাৎ কলকাতা চলে যেত। তিনটে বাচ্চা নিয়ে [তাঁর] চলাফেরা করা এখন আমি নিজেকে দিয়ে বুঝি। কত অসুবিধার মাঝে আম্মা পড়েছিল।

তখন আমার বয়স ১০ হবে। বাড়ী বিক্রীর টাকা কোর্টে জমা ছিল। সেই টাকা দিয়েই খাওয়া চলত, টান পড়লে গয়না বিক্রী।

একটু বড়ো হবার সাথে সাথে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়েটাও অন্য পাঁচটা মেয়ের মত নয়। কি রকম অস্বাভাবিক বিয়ে। আমাদের এক আত্মীয়, উনিই ঘটক। দেখতাম কি কি সব বলে আম্মাকে পটাত। আম্মাও হয়তো ভাবত : "মাথার ওপর কেউ নেই, ভালো একটা সম্বন্ধ এসেছে, মেয়েটা পার হয়ে যাবে; আমি নিশ্চিন্ত হব।"

আমার যে বয়সে বিয়ে হয়েছিল এখন সেই বয়সের মেয়েরা ফ্রক পরে বেড়ায়। জুন মাসে ১৫ বছর শেষ হয়ে ১৬ বছরে পা দিলাম আর অক্টোবরে বিয়ে হল। বিয়ের পর দিনই দেখলাম তিনটে সন্তান আমার পাশে। কিছুই আমার মাথায় এল না। এরা কারা? কেন আমায় আম্মা ডাকে? ৩/৪ মাস পর এক মহিলা এসে বাচ্চাদের সাথে কথা বলতে লাগলেন। আমার ননদ-জা এনাদের সাথে বাচ্চাদের ব্যাপারে কথা বলতে লাগলেন। তখন বুঝলাম ভদ্রমহিলা বাচ্চাদের মা। এদের বাড়ীতে আসার পর এদের জীবনযাত্রা আমার ভাল লাগত না। [সিলেটি] কথা বুঝতাম না। সারাদিন কাজের মধ্যে ডুবে থাকতাম। অথচ একবারও ভাবতাম না অন্য রকম জীবনযাত্রা আমার হতে পারত। এভাবেই কোনমতে বড়ো হলাম। চলতে লাগল ছেলেবেলা থেকে কৈশোর, তারপর বিবাহিত জীবনে প্রবেশ। কি যে দুঃসহ জীবন! কিছু ভালো লাগত না। তবু সব করে যেতে হত। অনেক বড়ো সংসার, লোকজন বেশী, ঝামেলা বেশী। ছেলেমেয়ে বেশী। নিজের ছেলেমেয়ে হল।

কৈশোর বলতে যা বোঝায়—আমার কৈশোর বলে সত্যি কিছু ছিল না। প্রথম কৈশোরেই গিন্নী হয়ে গেলাম; মানে বালিকা-গিন্নী যাকে বলে। ❑

বাংলাভাগে কংগ্রেস ও হিন্দু বাঙালি...

৯৩ পৃষ্ঠার পর

আগস্ট, বাংলা ও শ্রীহট্ট ১২ আগস্ট। কিন্তু মাউন্টব্যাটেন এই রায় চেপে রাখলেন যাতে ব্রিটিশদের আসন্ন রক্তস্নানের দায়িত্ব নিতে না হয়। তার সঙ্গে চলল কংগ্রেসের সুবিধামতো সীমানা যোগবিয়োগ। ১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও মধ্যরাত্রে (তাই ইংরেজি তারিখে ১৫) ভারত স্বাধীন হল। আসলে ১৫ আগস্ট শুভদিন ছিল না কিন্তু হিন্দুমতে যেহেতু পরের দিন ভোরের আগে নতুন দিন ধরা হয় না, তাই এই ব্যবস্থা! নেহেরু দিল্লিতে যজ্ঞ করে শুভসূচনা করলেন। এদিকে সদ্যগঠিত দেশগুলির শাসনযন্ত্র যখন টালমাটাল, জনগণের মধ্যে সীমানা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা তখনই মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো মাউন্টব্যাটেন ১৭ তারিখ উপহার দিলেন নতুন সীমানা। কেবলমাত্র ব্রিটিশ জীবন রক্ষা করার দায়িত্ব দেওয়া থাকল ব্রিটিশ বাহিনীর উপর। রক্তস্নান শুরু হয়ে গেল বাংলা ও পাঞ্জাবে, পরে দিল্লীতেও। স্বাধীনতার পর কংগ্রেসি ভারত পেল বিশ্বের দরবারে ব্রিটিশ রাজের ভারতীয় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার, রাষ্ট্রপুঞ্জে আসন এবং তিন চতুর্থাংশ অঞ্চল। ২০টি অস্ত্রধারী রেজিমেন্টের মধ্যে ১৪টি, ৪৮টি গোলন্দাজ রেজিমেন্টের মধ্যে ৪০টি, ২৯টি পদাতিক রেজিমেন্টের মধ্যে ২১টি এবং বায়ু ও নৌসেনার সিংহভাগ। এই বিরাট শক্তিই ছিল নেহেরু-প্যাটেলের অভীপ্সা। তার জন্য লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের গৃহহীন হওয়া, ধর্ষিতা হওয়া, খুন হওয়া সবই জায়েজ! ❑

তথ্যসূত্র

১। *বাংলা ভাগ হল,* জয়া চ্যাটার্জি
২। *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক,* বদরুদ্দীন উমর
৩। *বাংলা বিভাজনের অর্থনীতি-রাজনীতি,* সুনীতি কুমার ঘোষ
৪। *যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়,* কালীপদ বিশ্বাস
৫। *দ্য ইন্ডিয়ান আইডিওলজি,* পেরি এন্ডারসন

R.N.I REGN NO: 12026/65

ANEEK ❐ 59th Year ❐ 7-8th issue ❐ Jan-Feb 2023 ❐ RUPEES SEVENTY FIVE ONLY

পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে
মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে

অনীক-কে প্রদেয় টাকা ও চেক নিম্নলিখিত একাউন্টে পাঠাবেন—

ANEEK, Bank of India, College Street Branch

A/C No-402920110000399 IFSC Code- BKID0004029

টাকা বা চেক পাঠালে (+91) 9433724462/ (+91) 8334893569

ফোন নম্বরে গ্রাহক/দাতার নাম অবশ্যই মেসেজ/whatsapp/ ফোন করে জানাবেন।

অনীক-এর বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ২০০ টাকা (ডাক খরচ ৪০ টাকা)

বছরে যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

রেজিস্টার্ড পোস্টের জন্য অতিরিক্ত দেয় বছরে ২০০ টাকা।

কার্যালয়

১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট (দোতলায়)
কলকাতা -৭০০০০৯ (পিবিএস-এর পাশের ঘর)
সময় মঙ্গল ও শুক্রবার, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা।

যোগাযোগের ঠিকানা

অনীক। প্রযত্নে পিপলস্ বুক সোসাইটি।
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট।
কলকাতা - ৭০০০০৯, ফোন ২২১৯-৯২৫৬

Published by Subhasis Mukherjee on behalf of ANEEK Trust from 10/2B Ramanath Majumdar Street, Kolkata- 700009 and Printed by Man Mat Printers, Banamalipur, Barasat, North 24 Parganas, PIN- 700124. Editor- Pranab Kumar De